শিক্ষার প্রসার, ভাষার শক্তিবৃদ্ধি সবকিছুর জন্যেই প্রথম দরকার লিপিসংস্কার

রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য

''যেখানে মতে মিলচি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি৷ কেননা অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামানিকতা য়ে কম তা আমি বলব না -''

= রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা চিঠি (১৯৩৭)

''এমন দিন আসিতেছে যখন বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা জ্ঞান ও আনন্দের খনিতে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে৷ এই দুই গুণ হেতু বাঙ্গালা ভাষা ভারতী ভাষা হইতে পারিবে৷ কিন্তু অসংখ্য অক্ষরের কাঁটার বেড়া এই আশায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে৷ আমাদের শিশুরা এই বেড়া ভেদ করিতে পরিশ্রান্ত হইতেছে, অগণ্য নরনারী নিরক্ষর থাকিতেছে, ভারতের অন্য দেশবাসী বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে ভীত হইতেছে।''

- যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রবাসী (ফাল্গুন১৩৩৯)

আমাদের বানানবিধি নিয়ে নিরক্ষর ও অধ্যয়নার্থী শিশুদেরও কিছু বলবার থাকতে পারে৷ কারণ আমাদের লিপি ও বানানের অযৌক্তিক সব কানুন ঐ বেচারাদেরই সবথেকে বেশি বিব্রত করে৷ দুই বাংলা অসম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খন্ড মিলে দশকোটি বাঙালি নিরক্ষর৷ মূর্খতার সংখ্যাগুরুত্বে বাঙালি পৃথিবীতে এখন তৃতীয়৷ মান্ডারিন চীনা ও হিন্দির পরেই৷ পশ্চিমবঙ্গে এখন বছরে ১৬ লক্ষ শিশু প্রথমশ্রেণীতে পড়তে আসে৷ বাংলাদেশে আসে ২৯ লক্ষ৷ এরকম একটা অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পক্ষ নিয়ে এবিষয়ে দু-একটা কথা বলার প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি আমাদের একটু ভাববার-ও দরকার আছে।

বঙ্গলিপিতে সাক্ষরতা বা শিশুশিক্ষার কাজে যাঁদের হাতেকলমের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁরা অনেকেই বলেছেন যে বানানসংস্কারের আগে আমাদের প্রয়োজন লিপির সংস্কার৷ শিশুশিক্ষায় নেমে এ উপলব্ধি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের-ও৷ এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়, লিখেছেন হেমন্তকুমার সরকার (দ্র. দেশ ২রা জুন, ২০০৪)৷ লিখেছিলেন রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেব এবং আরো অনেকেই৷ সেই পাত্তা-না-পাওয়া যুক্তি সমূহের সঙ্গে আজকের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জুড়ে কয়েকটা প্রস্তাব এখানে রাখছি বয়স্কশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার কর্মীদের কাছে।

এখন দুই বাংলাতেই বয়স্ক নিরক্ষর ও প্রাথমিক শিশুদের যে পদ্ধতিতে বাংলা শেখানো হয় তাকে Electic Method বলা হয়৷ বিদ্বানেরা জানেন এ পদ্ধতির বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল জেনেভায়,১৯৪৯ সালে, জনশিক্ষা- সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে। এ পদ্ধতি অনুসারে অ, আ, ক খ, দিয়ে ছেলেবুড়ো কাউকেই এখন পড়তে শেখানো হয় না। ইংরেজিতে a b c দিয়ে এখনো পড়ানো শুরু হয় না। শুরুই হয় কোনো একটা শব্দ বা বাক্যাংশ দিয়ে৷ যেমন আমাদের কিশলয়ের (১৯৯৯) প্রথম পাঠ ছিল 'আম দই'৷ শিশুরা 'আম দই' পাঠ থেকে প্রথমে 'আ''ম''দ''ই'-এই চারটি বর্ণ চিনে উচচারণ করতে শিখবে৷ তারপর এই চারটে বর্ণ দিয়েই নতুন শব্দও বানাবে৷ যেমন -দম, মই.....ইত্যাদি৷ পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্র শিশু-বুড়ো সবাইকে এই পদ্ধতিতেই এখন পড়তে শেখানো হয় কারণ এ রীতিতে শিক্ষকনির্ভরতা কমিয়ে শিখনক্রিয়াকে অনেকটাই স্বাধীন করে ফেলা যায়। তাতে পড়ুয়ার নিজস্বতার বিকাশ দ্রুত ঘটে, স্মৃতিনির্ভরতা কমে, পঠনজগতের মজা সে শুরু থেকেই পায়। শব্দ, লিপি, শব্দার্থের জগতেও অনায়াসে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

বাংলায় এই যুক্তিনির্ভর আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ হলো কিন্তু লিপিসংস্কার হলো না। ফলে পড়ুয়ারা পড়লেন নানা বিপত্তিতে। যেমন বাংলাদেশে বয়স্কশিক্ষার এক প্রাইমারের প্রথম দুটি পাঠ ছিল 'বাবর'ও

‘আমিনা’। সেখানে আকারের (া) উচচারণও ‘আ’, আবার ‘আ’ হরফের উচচারণও ‘আ’। নিরক্ষর মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করতেন এটা কীরকম নিয়ম? তেমনি বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাইমারের প্রথম পাঠ ‘পরিবার’। এই পাঠের স্বরচিহ্নের যৌক্তিকতা পড়ুয়াদের বোঝাতে পাঠসহায়কদের কালঘাম ছুটে গেল। ‘ি’-কার বর্ণের আগে বসে অথচ পরে উচচারিত হয়, পরক্ষণেই ‘া ’-কার পরে বসে পরেই উচচারিত হয়। কেন? এরকম উল্টাপাল্টা কেন হবে লেখাপড়ার নিয়ম ? আবার এক-ই ‘ই’ বলবার জন্য চারটে আকৃতি যথা - ই, ঈ, ি, ী। ‘উ’ বলবার জন্য-ও চারটি। দুটি ন, দুটি জ, তিনটি ষ। এর কোনটা কখন কোথায় বসবে তার আবার পন্ডিতঠকানো নানা নিয়ম। এমতাবস্থায় পড়ুয়ারা নিত্য-ই দুই অর্থে-ই ‘দিশেহারা হয়ে পড়ছেন’। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘তিনটে ‘শ’ দুটো ‘ন’ ও দুটো ‘জ’ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে।..... সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর’। এমতাবস্থায় অবিরাম বানান মুখস্থ করে চলা ছাড়া বাংলার পঠন শিখিয়েদের কোনো গতি নেই। মাতৃভাষা পঠন শিখতে গিয়ে বাঙালি সমঝে যায় কিছু জিনিস বোঝা যায় না, সেগুলো মেনে নিতে হয়। যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি দিয়ে আমরা অযৌক্তিক লিপিজগতে ঢুকবার চেষ্টা করছি বলেই আমাদের নিরক্ষরতার এই বিপুল হার।

এসব কারণে স্বরচিহ্নের বিষয়ে উচচারণানুগ ও যুক্তিপূর্ণ প্রমিতীকরণ আমাদের প্রয়োজন। বাংলা পঠনের ধারা বাম থেকে দক্ষিণে। সেই প্রবাহমানতাকে ‘ি’, ‘ে’ এবং ‘ো’-কার ক্ষুন্ন করে। তাতে নতুন পড়ুয়া এমন কি কম্পিউটারে বাংলা মুদ্রকেরও অসুবিধা। আমাদের প্রথম প্রস্তাব স্বরচিহ্ন বর্ণের দক্ষিণে বসুক এমনকি সমস্ত বানানকর্তাদের পরমসাধের ‘ি’-কারের বদলেও ‘ী’-কার প্রাধান্য পাক। ‘ঊ’-কার বর্জিত হোক। এসব প্রস্তাব নিয়ে দু দেশের বাংলা আকাদেমি কী করবেন জানি না , বয়স্কশিক্ষার লোকেরা ও অন্য ভাবুকেরা আলোচনা শুরু করুন।

স্বরবর্ণ সম্পর্কেও একই কথা। বঙ্গভাষায় দু-তিনটে শব্দ লিখবার জন্য ‘ঈ’-কে রক্ষা করে যাওয়া অর্থহীন। ই দিয়ে ইগল, ইদ, ইশ্বর লিখলে কার কী অসুবিধে ? সেই একই কথা ঢ,ণ,ঋ,ঞ ইত্যাদি সম্পর্কেও। ঈ, ৎ, ঢ, ঙ, ঋ, ঐ, ঃ, ঞ, ঊ, ঔ প্রভৃতি দশহরফকে বর্ণমালা থেকে বর্জনের যে প্রস্তাব বহুদিন ধরে উঠছে তার সমর্থনে একটা নতুন যুক্তি আমরা সম্প্রতি পেলাম চলিত বাংলায় অক্ষরের ফ্রিকোয়েন্সি নতুন করে মাপতে গিয়ে।

গত একশ বছর ধরে চলিত বাংলার একটা সুচিহ্নিত স্যাম্পল থেকে গুণে দেখা যাচ্ছে আমাদের বর্ণজগতে সমানাধিকার নেই। বাংলার ৫০টি স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে র, ন, ক, ব, ত, ল, ম, স, প, য় -এই দশটি বর্ণ দখল করে আছে লিখিত বর্ণজগতের ৫৯ শতাংশ। আজকাল যিনি যাঁকে যা-ই লিখুন, ইচ্ছেকৃতভাবে বা কোনো বিষয়ের তাড়নায় বর্ণ-বিশেষের পক্ষাবলম্বন না করলে দেখা যাবে মোটবর্ণের ৫৫ - ৬০ শতাংশই ঐ দশবর্ণের দখলে। সব ভাষাতেই কিছু হরফ তুলনায় বেশি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলায় ব্যবহৃত কম ও বেশির মধ্যে পার্থক্য বিপুল। যেমন আমাদের সাধারণ লেখার ১৭-২০ শতাংশই ‘র ’ এবং ‘ন ’। কেন এই দশবর্ণের এ-রকম বিপুল পরাক্রম সে প্রসঙ্গ বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব -সংশ্লিষ্ট বিষয়। বরং এর উল্টোদিকটা আমাদের বেশি দরকার। ঈ, ৎ প্রমুখ দশটি হরফ বাংলায় সবথেকে কম ব্যবহৃত হয়। সমবেতভাবে হাজারে তিনবার। এদের পরাক্রম এত কম কেন সে প্রশ্নের একটা জবাব দেবার চেষ্টা করি।

বিগত একশ বছরের ভাষার দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় এই দশটি বাংলার ক্রমবিলোপী হরফ।একটি -দুটি তৎসম শব্দের আঁচল ধরে এগুলি বাংলা প্রাইমারের পাতা দখল করে আছে। শিশুরা ও বয়স্করা পাঠ্যপুস্তকে এগুলিকে প্রাণপনে শেখে কিন্তু জীবনে প্রয়োগ করবার সুযোগ বেশি পায় না। ঔ দিয়ে ঔষধ, ঐ দিয়ে ঐরাবত একবারই শেখে। এভাবে এক-একটি পাঠের পেছনে দুটি করে দিন গেলেও এই দশবর্ণ পাঠে সর্বমোট দেশের কতগুলো দিন নষ্ট হয় ? বাংলায় নতুন শব্দনির্মাণ, বা নবাগত তৎসম শব্দাবলীর

মধ্যে বা বাংলা ধ্বনির নিজস্ব প্রকৃতির সঙ্গেও এই বর্ণসমূহের বিশেষ যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে।’

‘ঈ’ প্রমুখ উপরের দশটি মৃতবর্ণানুগমনের ফলে স্কুলে স্কুলে শিশুমেধ ও নিরক্ষর বিতাড়ন দুটোই হচ্ছে। আমাদের NCERT ও বাংলাদেশের ‘এডুকেশন ওয়াচ ’-এর রিপোর্টে পূর্ব পশ্চিমের ভাষাশিক্ষার যে করুণ হাল দেখতে পাচ্ছি তার নানাকারণের মধ্যে এই হরফগুলি অবশ্যই একটি। এই হরফসমূহ কমিয়ে বাকি হরফ দিয়ে অনায়াসেই ভাষার ধর্ম রক্ষা করা যায়৷ তাতে মোট শ’খানেক চালু শব্দের বানান বদলাবে। যথা - ঋ-এর জন্য রি (ঋণ, না লিখে রিন)/ ঢ় বদলে র (আষার)/ ঊ বদলে উ/ ঐ বদলে অই/ ঈ বদলে ই/ ঙ বদলে ং, ঐ বদলে ওই/ ইত্যাদি। এর সঙ্গে শ, ষ, স এই তিনটির বদলে একটি ষ, একটি য এবং একটি ণ বর্জন করলে বাংলায় লিপির ভার কমবে প্রায় এক তৃতীয়াংশ। তাতে জটিলতা কমবে বহুলাংশে। লিপির এই সংস্কারের পর যুক্ত ব্যঞ্জনের সমস্যা, তারপর বানানের সমস্যা।

প্রতিবছর প্রথম শ্রেণীতে পড়তে আসা ৪৫ লক্ষ শিশুর সামনে সমস্ত আবর্জনা ছেঁটে আধুনিক লিপি খুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তেমনি কম্পিউটারের কি -বোর্ডেও মেদমুক্ত বর্ণমালা আমাদের সাজিয়ে নিতে হবে। লিপির মুদ্রণ-যোগ্যতা বাড়াতে হবে। চিদাম্বরমের বাজেট ছাপতে ইংরেজির যদি বারোঘন্টা লাগে, বাংলাকেও ঐ বারোর কাছাকাছিই যেতে হবে। নইলে আজীবনকাল বাংলা পাঠকেরা সব তথ্য সব নোটিশ সব চিঠি দেরিতে পাবেন। যাঁদের তাড়াহুড়ো আছে এ অবস্থায় তাঁরা কাজের ভাষা বদলে নেবেন। এই কারণেও আমাদের লিপিসংস্কার প্রয়োজনীয়। বয়স্ক ও শিশুশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের এই সব যুক্তি নিয়ে সমাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তথাকথিত বানান-বিজ্ঞদের হাতে এসব ছেড়ে রেখে আমরা দু’দেশেরই ক্ষতি করছি৷

অধিকাংশ জাতি বিগত পঞ্চাশ বছরে লিপি সংস্কার করেছে। যাঁরা ভেবেছেন সংস্কার অসম্ভব তাঁরা ‘সুনীতিপন্থায় ’ রোমানলিপির দ্বারস্থ হয়েছেন। আমরাও আজকাল রোমানলিপিতে ই-মেল করছি। এসব একেবারেই ভালো লক্ষণ নয়। সাহসী লিপিসংস্কার আমাদের আজ হোক কাল হোক করতেই হবে। আমাদের ভাষার শক্তিবৃদ্ধির এটাই সবথেকে বড় উপায়। আমাদের সাধের বর্ণমালা ছাড়বো তবু তাকে শোধরাবো না, এটা কোনো কাজের কথা নয়৷